৬ দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 16 AUG 1987 পৃষ্ঠা 6 কলাম

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বিরোধী চক্রান্ত রুখতে হবে

মোঃ জহিরুল হক শামীম

জনসংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠীর অধিবাস এই বাংলাদেশ। এ দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য পীর ফকিরের দরগাহ-মাজার। এ দেশের মাটি ধন্য হয়েছে বহু পীর আউলিয়ার পূণ্য পদধূলিতে। এছাড়া বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহর সারা বিশ্বে মসজিদ ও মিনারের শহর নামেই সর্বাধিক পরিচিত।

অতএব স্বাভাবিক কারণে বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিৎ ছিল সর্বাগ্রে। কিন্তু হয়নি। এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন মরহুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

তাঁর স্বপ্ন ছিল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম এমনভাবে বিন্যাস করা হবে যেখানে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এক হয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে।

যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তৈরী হবে এক একজন খাঁটি ঈমানদার বাঙ্গালী মুসলমান।

অবশেষে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে ঢাকা থেকে ২৫ মাইল উত্তরে ঐতিহ্যবাহী গাজীপুর জেলার বোর্ড বাজারে স্থাপিত হয়েছে এদেশের সর্বকনিষ্ঠ সপ্তম বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

মনোরম পরিবেশে সবুজ ঘাসে ছাওয়া চত্বর আর সুরম্য সিরামিক ইটের নির্মিত ভবনে থিওলজি ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের আওতায় আলকোরান ওয়া উলুমুল কোরান বিভাগ ও উলুমুল তাওহিদ ওয়াদ দাওয়াহ বিভাগ এবং মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের আওতায় হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা এই চারটি বিভাগ খুলে যাত্রা শুরু করে। চারটি বিভাগে মোট ৩০০ জন ছাত্র ভর্তি করে ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষবর্ষ শুরু করা হয়। প্রথম বর্ষের ক্লাশ শুরু হয় ১৯৮৬-এর ২৮ জুন।

ধারণা করা হয়েছিল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন সেসন জট হবে না, নির্ধারিত সময়েই ছেলেরা তাদের পাঠক্রম সমাপ্ত করতে সক্ষম হবে। কিন্তু এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে সুগভীর 'ঘৃণ্য চক্রান্ত'। যারা চায় না এ দেশে প্রকৃত অর্থে ইসলাম টিকে থাকে— তার আদর্শ ঐতিহ্য আচার অনুষ্ঠান তাহজীব তমুদ্দুন প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠুক।

তাদের সাথে ইতিমধ্যে হাত মিলিয়েছে আরেকদল যারা বাংলা ভাষা হতে আরবী ফার্সী শব্দ বর্জনের অপপ্রয়াসে লিপ্ত।

এই উভয় দল ভর করেছে সম্প্রতি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের আওতায় পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে যে ৬ জনকে এবং পরীক্ষায় একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়ায় যে ১৪ জনকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে তাদের ওপর।

ঢালাওভাবে বলা হচ্ছে, এদের অবৈধভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ দিবস স্বাধীনতা দিবস উদযাপন হয় না, জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় না, রবীন্দ্র সংগীত গাইতে দেয়া হয় না, হাততালি দেয়া যায় না। মারহাবা বলতে হয়— ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এসব ভিত্তিহীন অভিযোগের উপর ভিত্তি করে একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা প্রতিবেদন প্রকাশ করে চলেছেন। পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার দায়ে অব্যাহতি প্রাপ্ত ছাত্রদের বিষয়টিকে এসব নানা বানোয়াট কথা বলে একটা নৈতিক ভিত্তি দাঁড় করিয়ে বিষয়টি চাঙ্গা করে তুলতে চাইছেন। এ লক্ষ্যেই বলা হচ্ছে শহীদ মিনার নির্মাণে জড়িত থাকার করণে এসব ছাত্রকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

অথচ এসব ভিত্তিহীন অভিযোগের জবাব ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত ১৪ই জুলাই তারিখে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, যে ১৪ জন ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে তাদের সামনে পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার জন্য ৩টি সুযোগ ছিল। প্রথমে যে ২টি পরীক্ষা বিগত অক্টোবর ও জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হয় তাতেও তারা অকৃতকার্য হয়। অথচ তখনতো শহীদ মিনার নির্মাণের ঘটনা ঘটেনি? তাহলে? আমি বলবো, তাহলে আর কিছুই নয় তারা নিজেদের অকৃতকার্যতা ঢাকা দেয়ার অপপ্রয়াসে শহীদ মিনার নির্মাণকে একটা ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করছে। শহীদ মিনার নির্মাণে জড়িত থাকার দাবীর অজুহাতে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে 'পাস' করিয়ে দেবার বায়না ধরেছে।

কিন্তু মূল ঘটনা আরও ভেতরের। যারা চায় বাংলা ভাষা হতে ইসলামী শব্দমালা বর্জন করে এ দেশকে বিজাতীয় সংস্কৃতির একক লালন ক্ষেত্র বানাতে, ঘটনার মূল নায়ক তারা। তাই তারা এত তৎপর। তাই তারা বেছে নিয়েছে অব্যাহতি প্রাপ্ত এই ২০ জন ছাত্রকে। এদের দিয়ে তারা নানা বানোয়াট কথা বলিয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক রুটিন ওয়ার্কের বিষয়টিকে ইতিমধ্যেই বিতর্কিত করে তুলেছে। তারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায়।

তাই শহীদ মিনারের মত একটি জাতীয় চেতনাকে নিয়ে এদ্দিন পর আবারও টানা হেঁচড়া শুরু করা হয়েছে। শহীদ মিনার বা একুশে ফেব্রুয়ারী তো এদেশের গণ মানুষের প্রাণের সাথে বহু আগেই মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। অতএব দীর্ঘদিন পর জাতীয় অহংকার শহীদ মিনারকে নিয়ে এসব কেন? এদ্দিন পর শহীদ মিনার নির্মাণ নিয়ে হৈ-চৈ না করে বাংলা ভাষা সর্বস্তরে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় মন দিলে শহীদের বিদেহী আত্মা অধিকতর পরিতৃপ্ত হবে নয়-কি? বলা হচ্ছে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতা বিরোধীরা তৎপর। স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ দেড় যুগ পর স্বাধীনতা বিরোধী এবং স্বাধীনতার পক্ষে বলে আদৌ কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে কি?

অতএব দীর্ঘদিন পর এসব ছেঁদো কথা কেন? আজকে যারা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তাদের বয়স কত ছিল? অতএব তাদের পক্ষে স্বাধীনতার পক্ষে বা বিপক্ষে যাবার অবকাশ কোথায়? ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে লেখা হচ্ছে "ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে মিনি পাকিস্তান হতে দেবো না।" এসব কথা হীনমন্যতার পরিচয় কি বহন করে না? বলা হচ্ছে, "ইসলামী তাহজীব তমুদ্দুন প্রচলনের নামে ক্যাম্পাসে ছাত্রদের স্বাধীনতাবোধ ও মানসিকতা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়ে থাকে।" ইসলামী তাহজীব তমুদ্দুন প্রচলিত হলে ছাত্রদের স্বাধীনতাবোধ ও মানসিকতার নিয়ন্ত্রণ বোঝায় এটা কোন ধরনের অদ্ভুত স্বাধীনতাবোধ বা মানসিকতা? জানতে ইচ্ছে করে।

কোন অনুষ্ঠানে হাততালি দেয়া না দেয়ার সাথে স্বাধীনতাবোধের কী সম্পর্ক আছে? আর হাততালি দেয়াটা কি বাঙ্গালী ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত? নাকি ভিন্ন কোন সংস্কৃতির ধারক বাহক?

উচ্চস্বরে আরবী শব্দ 'মারহাবা' বললে যদি বাঙ্গালীত্বে আঘাত লাগে তাহলেতো বাঙ্গালী মুসলমানদের জীবন থেকে হাজার হাজার আরবী ফার্সী শব্দ বাদ দিতে হয়। ইসলামী ধ্যান-ধারণা অজ্ঞাত শব্দাবলীর প্রতি এতই যদি অনীহা তাহলে তো আমাদের নামধামগুলো বাঙ্গলা শব্দের সাথে মিলিয়ে "শরৎ", "পূণ্য", "শশী", "জলধর", বঙ্কিম" এসব রাখতে হয়। "পানি" না বলে "জল" বলতে হয়। নামের পূর্বে "মোঃ" না লিখে বাংলায় "শ্রী" লিখতে হয়।

"খোশ আমদেদ" বললে যদি বাঙ্গালিত্বে আঘাত লাগে তাহলেতো, "ইনতেকাল" না বলে "মহাপ্রয়াণ" বলতে হয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র যদি ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা কী তা আজও না জেনে থাকে তাহলে "কি বিচিত্র এই দেশ সেলুকাস" বলা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান লিখেছেন, সংস্কৃতি, কালচার এবং তাহজীব সম অর্থবোধক। পরিভাষায় বিশ্বাসলব্ধ মূল্যবোধ উদ্ভূত পরিশীলিত ও মার্জিত মানসিকতাকেই সংস্কৃতি বা তাহজীব বলা হয়। ভাষা, বর্ণ, গোত্র, অঞ্চল প্রভৃতি সংস্কৃতি বা কৃষ্টির ক্ষেত্রে নিয়ামক নয় বরং প্রভাবশীল উপকরণ মাত্র। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশের কোন এক এলাকায় দুই প্রতিবেশী বাস করে, একজন হিন্দু অপর একজন মুসলিম। দুই জনই বাংলায় কথা বলে। দুই জনই একই বর্ণের। দুই জনই জীবন ধারণ করার জন্য আহার করে, কাপড় পড়ে, নিদ্রা যায়। একজন গাভীকে দেবী বলে পূজা করে, আর একজন কোরবানী দিয়ে গোসত ভক্ষণ করে পূণ্য অর্জন করে, একজন মৃত্যুবরণ করলে শ্মশানে চিতা ভস্মে পরিণত করে, অপরজন আতর লোবান মিশিয়ে কাফন দিয়ে দাফন করে।

একজন ধূপ-ধুনা-ধান-দূর্বা দিয়ে নব বধূকে বরণ করে, আর একজন আল্লাহ রসুলের নাম নিয়ে দোয়া করে। একজন আপদে বিপদে রাম রাম বলে আকুতি করে, আর অন্যজন ইয়া আল্লাহ, ইয়া খোদা বলে শক্তি সঞ্চয় করে। একজন নিজ হস্তে তৈরী পুতুলের উপাসনা করে, আর একজন নিরাকার স্রষ্টার এবাদত করে। যদিও একই অঞ্চলের লোক, একই আবহাওয়ার মানুষ, একই ভাষায় কথা বলে, তবুও যেহেতু মানসিকতার উৎস্য বিশ্বাস এক নয় তাই তাদের ব্যবহারিক জীবনে জন্ম নিয়েছে দুই ভিন্ন জীবন পদ্ধতি বা সংস্কৃতি। ইংরেজীতে যারা কথা বলে অথবা ভারতে যারা বাস করে তারা সবাই একই সংস্কৃতির মানুষ নয়। সংস্কৃতি তাই মাটিতে বা অক্ষরের আবরণে বা রক্তের প্রবাহে জন্মায় না। এর জন্ম মনে। জীবনের নৈমিত্তিক আচার-আচরণে।

অতএব যারা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অব্যাহতিপ্রাপ্ত ২০ জন ছাত্রদের জবানীতে নানারকম উদ্ভট কথাবার্তা বলিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চান তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, "শুভেচ্ছা, স্বাগতম" নয়, "খোশ আমদেদ" বলতে চেষ্টা করুন। আর কত বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণ করে "হাততালি" দেবেন এবার "মারহাবা" বলতে চেষ্টা করুন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাই বাঙ্গালী ছিলেন না। কাজী নজরুল ইসলাম এবং ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ ব্যক্তিরাও বাঙ্গালী ছিলেন। যদি সাম্প্রদায়িকতার কথা বলা হয় তবে রবীন্দ্রনাথের কথা বলাই ভাল। আর বাংলা ভাষায় যারা কথা বলে তাদের মধ্যে হিন্দুর তুলনায় মুসলিমরা অধিক। মরহুম মোতাহার হোসেন চৌধুরী শান্তি নিকেতনে কবিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনার লেখায় ইসলাম ও বিশ্ব নবী সম্পর্কে কোন কথা নেই কেন?" উত্তরে কবি বলেছিলেন, "কুরআন পড়তে শুরু করেছিলাম, বেশী দূর এগুতে পারিনি; আর তোমাদের রসুলের জীবন চরিত্র ভালো লাগেনি।" এটাই স্বাভাবিক। তার কাছে একজন হিন্দুর পক্ষে অন্য কোন আদর্শ ভাল না লাগারই কথা। এটাই সংস্কৃতির দাবী তাই তার সৃষ্টি বাঙ্গালী সংস্কৃতির নয় হিন্দু সংস্কৃতির বাহক। (ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান)। কাজী নজরুল ইসলাম দু'হাতে লিখেছেন শ্যামা সংগীত এবং ইসলামী গান ও গজল। অতএব বাঙ্গালীর কবি বললে এবং বাঙ্গালী মুসলমানের কবি বললে কাজী নজরুলের কথাই বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার হিন্দুদের সংস্কৃতির বাহক। বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মুসলমানের নয়। মুসলমানের সংস্কৃতি আলাদা। অতএব, হিন্দুরা বিপদে আপদে যেমন রাম রাম বলে আর মুসলমানেরা বলে ইয়া আল্লাহ, ইয়া খোদা তেমনি আনন্দে উৎসবে হিন্দুরা বলুক যা খুশী মুসলমানেরা বলবে মারহাবা মারহাবা। এটাই সংস্কৃতির দাবী।